নেপথ্য শক্তিও আসুক আইনের আওতায়

জঙ্গিবাদ | ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর; নিরাপত্তা বিশ্লেষক

র‍্যাবের একটি দল সোমবার রাতে রাজধানীর নীলক্ষেত ও ধানমণ্ডি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক দুই লেখক অভিজিৎ রায় ও অনন্ত বিজয় দাশ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে 'সরাসরি' যুক্ত তিন জঙ্গিকে এমন সময় আটক করতে সক্ষম হলো, যখন একের পর এক ব্লগার খুন হচ্ছিলেন এবং ঘাতকরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছিল। ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা থেকে বের হওয়ার পর জনাকীর্ণ টিএসসি এলাকায় কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল অভিজিৎ রায়কে। পরের মাসে তেজগাঁও এলাকাতেও দিনদুপুরে একইভাবে কোপানো হয়েছিল ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে। তার পরের মাসে সিলেটে একই কায়দায় সকালবেলা খুন হয়েছিলেন অনন্ত বিজয় দাশ। আর এ মাসে ঢাকার খিলগাঁওয়ে রীতিমতো ঘরে ঢুকে হত্যা করা হয় নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় বা নিলয় নীলকে। এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্নজনের নাম আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বরাতে সংবাদমাধ্যমে এসেছে; কিন্তু তাদের আইনের কাঠগড়ায় দেখা যায়নি। আবার বাবুর ঘাতকদের দু'জনকে যদিও হিজড়াদের একটি দল আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছিল, তাদের 'মাস্টারমাইন্ড' রয়ে গেছে অধরা। এসব নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে কেবল আতঙ্ক নয়, হতাশাও বিরাজ করছিল, স্বীকার করতে হবে। অবশ্য কয়েক দিন আগে, ব্লগার নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় হত্যাকাণ্ডের পর আরও দু'জনকে আটক করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের 'অর্থ জোগানদাতা' হিসেবে চিহ্নিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত একজনসহ এই তিন জঙ্গি আটকের পর সব মিলিয়ে সাতজনকে ধরা সম্ভব হলো। আমি মনে করি, এর মধ্য দিয়ে কিছুটা স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল।

এদের আটকের মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি আরেকবার প্রমাণ হলো তা হচ্ছে, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী জঙ্গি দমনে যথেষ্ট দক্ষ ও সমর্থ। সত্যিকারের প্রচেষ্টা চালাতে পারলে তারা ব্লগার হত্যাকারীসহ জঙ্গি ও চরমপন্থিদের দমন করতে পারবে। সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখছি, এদের আগেই চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং আটকের জন্য অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তার মানে, আমাদের তদন্ত দলও এ ধরনের অপরাধী শনাক্তকরণে সামর্থ্য অর্জন করতে পেরেছে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে গোপন জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের শনাক্ত ও আটক করা সহজ কাজ নয়।

এই আটকের মধ্য দিয়ে আরেকটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। তা হচ্ছে, সব ব্লগার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমই জড়িত। বিভিন্ন ব্লগার হত্যাকাণ্ডের পর তারা যে ফেসবুক পেজে বা মিডিয়ায় ই-মেইল পাঠিয়ে দায় স্বীকার করেছে, তার ভিত্তি রয়েছে। আর একেকজন ব্লগার হত্যার পর কেউ কেউ রাজনৈতিক ও সামাজিক রঙ লাগাতে চেষ্টা করেছেন বা একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছেন; এখন দেখা যাচ্ছে, এসবের ভিত্তি নেই। জঙ্গিবাদীরাই এসব হত্যাকাণ্ডের ঘাতক ও খলনায়ক।

আমি বিশ্বাস করি, উপকরণগত দিক থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেলে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করেন, তাদের আরও প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশন দিতে পারলে ঘাতক ও জঙ্গিদের নেপথ্যে যারা আছে, তাদেরও আইনের আওতায় আনা কঠিন হবে না। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি, জঙ্গিরা অনেক চতুর হয়ে থাকে। তারা একটি অপরাধ সংঘটিত করে মানুষের মধ্যে মিশে যায় এবং এত সাধারণ জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে যে, সহজে চিহ্নিত করা যায় না। তারপরও আমাদের আইন-শৃঙ্খলা

রক্ষাকারী বাহিনী সাফল্য দেখিয়ে চলেছে। আমাদের মনে আছে, ২০০৪-০৫ সালে শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুর রহমান বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে জেএমবির যে উত্থান ঘটেছিল, সেটা কিন্তু আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে দমন করতে পেরেছে। জেএমবির 'টপ ব্রাস' আটক হয়েছে এবং তাদের ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে।

এখন যে বিষয়টিতে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে তা হচ্ছে, কারাগারে আটক জঙ্গিদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা। সর্বশেষ তিনজন আটকের পর দেখা যাচ্ছে, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের মাস্টারমাইন্ড কারাগারে আটক থেকেও তার অনুসারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন এবং রীতিমতো নির্দেশ দিচ্ছেন। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পরিবারের সদস্যরাও এসব নির্দেশনা নিয়ে আসছেন এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। তার মানে কারানিরাপত্তায় গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে। জঙ্গিদের যখন বিভিন্ন সময়ে কারাগার থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়, আদালতের হাজতখানায় রাখা হয় কিংবা এক কারাগার থেকে আরেক কারাগারে স্থানান্তর করা হয়; তখনও কড়া নিরাপত্তা ও সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। আমরা দেখেছি, গত বছর ফেব্রুয়ারিতে জেএমবির মজলিসে শূরা সদস্য চার জঙ্গিকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়ার পথে ত্রিশালে কীভাবে হামলা চালিয়ে ছিনতাই করা হয়েছিল। তারা আগে থেকেই জানত যে, এই জঙ্গিদের কখন ও কোন পথে প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হবে। তখনও প্রশ্ন উঠেছিল যে, কারাগারেই রয়েছে বাইরে থাকা জঙ্গিদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সোর্স। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সোর্স বন্ধ করতে না পারলে এত কাঠখড় পুড়িয়ে জঙ্গিদের আটক করে কী লাভ?

আমাদের কাশিমপুর কারাগার 'হাই সিকিউরিটি' মানের বলে জানি। সেখানেই যদি জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকে, তাহলে অন্যান্য কারাগারের অবস্থা বলাই বাহুল্য। বিদেশে এ ধরনের জঙ্গিদের অন্যান্য কয়েদি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। আর আমাদের এখানে তারা কারাগারে গিয়ে সবার সঙ্গে মিশছে। যতদূর মনে পড়ে, বছরখানেক আগে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখেছিলাম, আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের নেতা জসীমুদ্দিন রাহমানী অন্য কয়েদিদের নিয়ে 'ধর্মালোচনা' চালাচ্ছেন। তার মানে, কারাগারে গিয়েও তিনি জঙ্গিবাদ প্রচারের সুযোগ পাচ্ছেন! এছাড়া এ ধরনের জঙ্গি কয়েদিদের সঙ্গে কারা দেখা করতে পারবেন, কতক্ষণ দেখা করতে পারবেন, তারও একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। সেখানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা রক্ষী থাকা অত্যাবশ্যকীয়। যদি সেই নিয়ম মেনে চলা হয়, তাহলে কীভাবে নির্দেশনা যায়? কারাভ্যন্তরে সামান্য পয়সা ব্যয় করে মোবাইল ফোনে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সুযোগ নিশ্চয়ই জঙ্গিরাও কাজে লাগায়।

আমি মনে করি, আমাদের কারা নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। বিশেষ করে কারাগারে আটক জঙ্গিদের ব্যাপারে থাকতে হবে উচ্চমাত্রার সতর্কতা। উন্নত বিশ্বে জঙ্গি বা ভয়ঙ্কর অপরাধীদের সঙ্গে বাইরের কারও দেখা করার সময় সরাসরি দেখারও সুযোগ থাকে না। তাদের কথা বলতে হয় একটি কাচের দেয়ালের দুই পাশ থেকে ইন্টারকমের মাধ্যমে। এ ধরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশেও চালু করা উচিত।

জঙ্গিদের 'ইন্টারন্যাশনাল লিংক' নিয়েও আমাদের আরও ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। সর্বশেষ আটক তিনজনের মধ্যে একজন তৌহিদুর রহমান বাংলাদেশ থেকে গিয়ে ব্রিটেনের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশে এসে জঙ্গিদের অর্থ জোগান দিচ্ছেন। তার মানে, তিনি উন্নত বিশ্বের নাগরিকত্বের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের সর্বনাশ করতে এসেছেন। উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও উদারবাদী পরিবেশ কি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে 'জঙ্গিবাদ রফতানি' করছে? আমাদের ভেবে দেখতে হবে। দেখা গেছে, ব্রিটেনে প্রবাসী বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তরুণ ও তরুণীরা সেখান থেকে তুরস্ক হয়ে সিরিয়া বা ইরাকে পাড়ি জমিয়ে আইএসে যোগ দিচ্ছে। আর তাদের কারণে বাংলাদেশে ছড়াচ্ছে জঙ্গিবাদ ও সহিংসতা। কিছু দিন আগে ব্রিটেন প্রবাসী একটি বাংলাদেশি পরিবার ছুটি কাটাতে দেশে এসে ফেরার পথে তুরস্কে গিয়ে দিক বদল করে সিরিয়ায় চলে গেছে। কয়েক বছর আগে এক বাংলাদেশি তরুণ যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে গিয়ে স্টিং অপারেশনে আটক হয়েছিল। এখন সে সাজা ভোগ করছে। ফলে আমাদের তরুণ-তরুণীরা বিদেশে গিয়ে কী করছে, সে ব্যাপারে অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।

এবারে যে তিনজন আটক হয়েছে, তার মধ্যে একজন আমিনুল মল্লিক 'পাসপোর্ট এক্সপার্ট'। সে পাসপোর্ট অফিসে দালাল হিসেবে কাজ করে এবং জঙ্গিদের ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে পাসপোর্ট তৈরিতে সহায়তা করে। আমরা জানি, সাধারণ মানুষের পাসপোর্ট পেতে কতটা হয়রানির শিকার হতে হয়। সেখানে জঙ্গিরা সহজেই, কোনো তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়াই কীভাবে পাসপোর্ট পায়, কর্তৃপক্ষকে সেটা খতিয়ে দেখতেই হবে। পাসপোর্ট অফিসে আরও কোনো জঙ্গি সহায়তাকারী রয়েছে কি-না দেখা দরকার। সরষের মধ্যেই ভূত থাকলে জঙ্গিবাদের ভূত সহজে তাড়ানো যাবে না, মনে রাখতে হবে।

সতর্কতা ও নজরদারির পাশাপাশি তরুণ সমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকেও নজর দিতে হবে। মনে রাখা জরুরি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক হতাশা থেকে অনেকে জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতেই হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতা, উদারতার শিক্ষা দিতে হবে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে জানাতে হবে।

জঙ্গিবাদ বাংলাদেশ তথা বিশ্বের জন্য বিরাট নিরাপত্তা হুমকি। একে হালকাভাবে নেওয়ার অবকাশ নেই। তবে জনসাধারণ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সম্মিলিতভাবে কাজ করলে জঙ্গিবাদ পরাস্ত করা কঠিন হবে না।